IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা :

(Role of Women in Anti-Partition and Swadeshi movement in Bengal)

পুলক কুমার দাস
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, কালিনগর মহাবিদ্যালয়
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
গবেষক, OPJS UNIVERSITY
চুরু, রাজস্থান, ভারত

সারাংশ (Abstract):-

বৃহৎসংহিতায় বলা হয়েছে, নারীরা হলেন 'গৃহলক্ষ্মী' আবার মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, নারী হলেন 'গৃহের দীপ্তি'। এই 'গৃহলক্ষ্মী' কিংবা 'গৃহের দীপ্তি'-রা যখন আন্দোলনে অংশ নেয়, তখন তার অর্থ বদলে যায়। এই রকমই একটি আন্দোলন হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলে বাঙালী জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বিদেশি পণ্য বর্জন তথা বয়কট, বিদেশি পণ্য বর্জনে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার, দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার-এ লক্ষ্যে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বতোভাবে আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য সর্বস্তরের নারীর সহযোগিতা তথা সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। ফলে এ আন্দোলন প্রধানত পুরুষ সমাজ অংশগ্রহণ করলেও বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও দেখাশোনা, সংবাদ ও অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি কাজে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ শাসন বর্জন ও বিলেতি পণ্য বয়কট করে স্বরাজ লাভের জন্য ভারতবর্ষে সর্বত্র স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য পরিচালিত এই আন্দোলনে নারীসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। নারীরা সুতা তৈরীর জন্য চরকা কাটতে এবং তা থেকে কাপড় বুনতে, আমদানী করা বিদেশী পণ্য বিক্রি করা দোকানের সামনে পিকেটিং এবং সভ্য সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। সরলাদেবী 'ভারতী' সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া বাঙালী নারীদের আত্মবিকাশের ভিত্তি তৈরী করেছিল, যা ছিল নারী জাগরণের অন্যতম বড় পদক্ষেপ।

শব্দসূচক (Keywords) : বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, চরকা, বয়কট, পিকেটিং, সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, বিপ্লবীদের সহযোগিতা, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবদা, নারী জাগরণ।

ভূমিকা (Introduction) :

তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙালি ছিল সর্বাগ্রগণ্য। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও ছিল বাঙালির হাতে। এক কথায়, বাঙালি তখন সমগ্র ভারতকে পথ দেখাত। বাঙালির এই প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন আতঙ্কিত হন। তাঁর মতে, বাংলা ছিল 'অশান্তির উৎস'। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালিকে দুর্বল করে সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাঁর আমলে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব কার্যকারী করা হয়। এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা তথা ভারতে যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়, তা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত। আন্দোলনের কৌশলের অন্তর্গত ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটিয়ে সর্বত্র স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার শুরু করা। এ আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি নারী পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে দুঃসাহসিকতার

পরিচয় দেন। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে গৃহবন্দী নারী-সমাজের বৃহৎ অংশ এই প্রথমবারের মতো জাতীয় দুর্যোগে এগিয়ে আসেন। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেন। মূলত, স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যা নারীমুক্তি আন্দোলনের নামান্তর।

গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology) :

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও আত্মজীবনী প্রাথমিক উৎস হিসেবে এবং আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী দ্বৈতিয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য প্রবন্ধটি রচনায় মানবিক বিদ্যা গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান-এ দুটি রীতিই অনুসরণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of the Reasearch) :

১। এই গবেষণাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য পুরুষরা কেন তাদের আহ্বান জানালেন, তার কারণ নির্ণয় করা।

২। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের যোগদানের আগে নারী মানসের পূর্ব প্রস্তুতি কেমন ছিল, তার অনুসন্ধান করা।

৩। পুরুষরা কীভাবে নারীদের এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার স্বরূপ উদঘাটন করা।

৪। এই গবেষণাকর্মটির আর একটি উদ্দেশ্য হল কীভাবে বাঙালী নারী সমাজ দীর্ঘদিনের অবরোধ প্রথার অচলায়তন ভেঙে রাজনীতি সচেতন হয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন, তা বিশ্লেষণ করা।

৫। সাহিত্যের মাধ্যমে নারীদের স্বদেশী প্রচারের ধরণ নির্ণয় করা।

৬। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বৈপ্লবীক কার্যকলাপের স্বরূপ উন্মোচন করা।

৭। এই গবেষণাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল নারীরা পুরুষদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য কিনা এবং নারীর আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পেল কতটা, তার অনুসন্ধান করা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Interpretation and Analysis) :

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকারী হয়। সেদিন সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নেতৃত্বে সেইদিন নগ্নপদে এক বিরাট মিছিল গঙ্গা স্নানে যায় এবং স্নানের পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একে অন্যের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। রাখি ঐক্যের প্রতীক, ভ্রাতৃত্বের প্রতীক-উভয় বঙ্গের মিলনের প্রতীক। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে সেদিন সারা দেশে অরন্ধন পালিত হয়। ঐ দিন ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে উভয় বাংলা ঐক্যের প্রতীক 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলার ভাই-বোনদের মৈত্রী বন্ধনের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আহ্বান জানালেন এইভাবে -

"বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরের যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

বলাবাহুল্য যে, এতদিন যে সমস্ত পুরুষেরা শিক্ষার আলোক কিছুটা পেয়েছিলেন, কিছু রাজনৈতিক আলোচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তারাই স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুললেন। এবারে তারা স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের আহ্বান জানালেন। এর পিছনে বেশকিছু কারণ ছিল। প্রথমত: কোন জন আন্দোলন সফল করতে হলে জনসংখ্যার অর্ধেক নারীদের সমর্থন অতি আবশ্যক-এই অতি সহজ সত্য পুরুষেরা উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত: উনিশ শতকে নারী জাগরণ প্রধানত পুরুষের হাত ধরে ঘটেছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা সখ্যতা, সহমর্মিতা এবং সাযুজ্যের প্রয়োজন-বাঙালী পুরুষ ক্রমেই

অনুভব করেছিলেন। তৃতীয়ত: মেয়েরা ছিলেন ঘরের কাজের প্রধান চালিকা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসপত্র নারীর হাতেই গৃহপরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হত। তাই বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করতে নারীদের অংশগ্রহণ জরুরী ছিল। স্বভাবতই, জাতীয় জীবনে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ মূহূর্তে পুরুষের সহচরী ও সহকর্মী হবার আহ্বান মেয়েদের কাছে এলো।

এই আন্দোলনে মেয়েরা সাড়া দিলেন। তার প্রকৃত কারণ হল যে, তাদের মনজগতের প্রস্তুতি বেশকিছুদিন ধরেই চলছিল। উনিশ শতকে, বিশেষ করে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সমাজ-সংস্কার ও নারীশিক্ষা প্রচার-এই দ্বিমুখী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল এবং ১৮৭৬ সালে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুমুদিনী খাস্তগীর কিছুদিনের জন্য বাংলার বাইরে শিক্ষকতা করে এসেছিলেন। অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রচারে অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিধবা মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করারর শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজসেবী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিধবাশ্রম' ১৮৭৭ সালে স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন ধীরে ধীরে কুসংস্কারের আবরণ ঘুচিয়ে ফেলেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়াও নারীদের অন্দর মহল পৌঁছেছিল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী এই সংগঠনে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ২০০জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।সত্যি ক্রমশ কংগ্রেসে মেয়েদের যোগদান বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং স্বদেশিকতার অনুপ্রেরণা ঘরের ভিতরেও মেয়েদের মনে সাড়া জাগাচ্ছিল। এইভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের যোগদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রতধারন' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে দেবীদুর্গার সাথে তুলনা করে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি মেয়েদের কাছে এবছরে ভাইফোঁটার খরচ বাঁচিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত জাতীয় তহবিলে অর্থদানের আহ্বান জানান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিত্রকলায় ভারতকে 'ভারতমাতা' রূপে চিত্রিত করেন। কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী স্বদেশী আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই ব্রতকথার ভাবমর্মটি এই যে, লক্ষ্মীদেবী বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বাংলার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েরাই শুধু তাঁকে ধরে রাখতে পারেন হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে মৈত্রীবন্ধন গড়ে এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে। চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) গেয়েছেন -

"ও আমার বঙ্গনারী
পরো না বিলেতী শাড়ী
ভেঙ্গে ফেলো বেলোয়ারী চুড়ি।"

আবার, 'ভারত মহিলা' পত্রিকায় (১৯০৫ সালে প্রকাশিত) প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে, "রাজনীতি হউক আর শিল্প-বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পাশে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষের শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না।" মনমোহন চক্রবর্তীর 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী, কভু হাতে পরো না, জাগো ওগো মা ভগিনী, মোহের ঘোরে আর থেকো না' - গানটি বাঙালী নারীর মধ্যে স্বদেশী চেতনা উজ্জীবিত করতো। এ সময় জাতীয় নেতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, নিবারণ চন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা তাদের সম্মোহনী ভাষণের মাধ্যমে নারীকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। এভাবে কবি, সাহিত্যিকি, প্রাবন্ধিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন ধারার ব্যক্তিবর্গ বিলেতি পণ বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে নারী-সমাজকে উৎসাহিত করেন। ফলে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা দলে দলে অংশগ্রহণ করলেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)। তিনি নানাভাবে নারীর আত্মশক্তি অর্জনের অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য 'অন্তরঙ্গ' নামক একটি নারীদল গঠন করেন। অন্যদিকে, সরলাদেবী সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের সঙ্গে নারী-পুরুষকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। তাঁর রচিত 'নমো হিন্দুস্তান' শীর্ষক গানটি ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের এক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। সরলাদেবী স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার প্রচারণার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা স্বদেশী বস্ত্র ও নানা জিনিসপত্রের দোকান। উল্লেখ্য, সরলাদেবী সারাজীবন স্বদেশী পোশাকে সজ্জিত থেকেছেন। তিনি ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির 'প্রতাপাদিত্য ব্রত্য'র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং এ অধিবেশনে সর্বপ্রথম জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' গানটি সামান্য পরিবর্তন করে

সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে শোনান। উল্লেখ্য, এ বছরই (১৯০৫ সাল) পাঞ্জাবের আর্য সমাজের নেতা পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর সাথে সরলাদেবীর বিবাহ হলে তিনি স্বামীর সাথে পাঞ্জাবে চলে যান। তা সত্ত্বেও এই বঙ্গনারী পাঞ্জাবে এবং বাংলায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারের কাজ করে যান। লাহোরে 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, আর বাংলায় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক কাজ চালিয়ে যান। এইভাবে গানে, লেখায়, বক্তৃতায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা দানে স্বদেশী আন্দোলনে সরলাদেবীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন পূর্ব বাংলার খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৮০-১৯১২)। তিনি দেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিদেশী কৌটায় গুড়া দুধের পরিবর্তে দেশী গোরুর দুধ, বিদেশী চিনির পরিবর্তে দেশী আখের চিনি ও খেজুরের গুড় খাওয়ার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। আবার বিদেশী চুরুট ও সিগারেটের বিষাক্ত নেশা ত্যাগ করার জন্য পুরুষ সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি স্বদেশী ভাবধারার মেয়েদের উদ্‌বুদ্ধ করে বলেন - বোম্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে নানারকম ধুতি ও রেশমী শাড়ি এবং চিকন কাপড় প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্ত্র ব্যবহার করলে দেশের টাকা দেশেই থেকে যাবে, নিজ দেশের শিল্পের প্রসার ঘটবে, গরীব শ্রমজীবী তাঁতীরা অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারবে। এছাড়া, বরিশালের স্বল্পবয়সী গৃহবধু মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) হাতের কব্জিতে হলুদ রঙের সুতার রাখি বেঁধে স্বদেশী আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সারাটি জীবন মনোরমা বসু বাংলার রাজনীতির সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন। ১৭ বছর বয়সী গৃহবধূ লাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮১-১১৯৭১) তাঁর পরিবারকে বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বামী যতীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করেন। স্বদেশীযুগে নিম্নলিখিত ছড়া দুটি মেয়েদের মুখে মুখে ফিরত -

"সুরেনদাদা বলে গেছে মতিদাদার বাড়ি,
মেয়েরে সব শাঁখা পর কাঁচের চুড়ি ছাড়ি।"
"ভূপেনদাদা বলে গেছে শোন রে খোকার মা,
রান্নাঘরে বিলিতি লবণ আর কখনও এনো না।"

স্বদেশী আন্দোলন সফল করার জন্য বাঙালী মেয়েরা কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিক্রমপুর, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করেছেন। মানিকগঞ্জের বয়রাতে সুশীলা সুন্দরী গুপ্তা এক সভায় নেতৃত্ব দেন। আবার খুলনায় স্নেহশীলা চৌধুরীর নেতৃত্বে এ রূপ সভার আয়োজন করা হয়। পুরুষের প্রকাশ্য সভার মঞ্চে নারী আসন গ্রহণ করতেন। অনেক সময় মেয়েরাও বক্তৃতা করতেন। ১৯০৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার গোণ্ডরিয়ায় দীননাথ সেনের বাসভবনে মেয়েদের একটি স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে নানা জায়গায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন শুরু হয়। এ সময় ঢাকার মুন্সিগঞ্জে ক্যাপসুল (ওষুধ), বরিশালের উজিরপুর, রহমতপুর ও কীর্তিপাশা গ্রামে কলমের নিব তৈরী হয়। কলকাতার দি গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি সিমেন্ট ও পেইন্টার রঙ উৎপাদন শুরু করে। আবার বাঙালী মেয়েরা চরকায় সুতো কেটেছেন। উল্লেখ্য, কলকাতায় চরকার ব্যাপক প্রচলন হয়। অন্যদিকে, বিক্রমপুরের নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলকামিনী গুপ্তা প্রমুখ নারী একত্রিত হয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। ২৪টি চরকা কিনে তাঁরা সুতা প্রস্তুতের জন্য গ্রামের নারীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

লেখনীর মাধ্যমে স্বদেশী প্রচারে মেয়েরা বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লেখার মূল লক্ষ্য ছিল, বিদেশী দ্রব্য বর্জনে নারী-পুরুষ সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করা। ঢাকা থেকে শরৎকুমারী দেবী লিখলেন – "করহ প্রতিজ্ঞা দিব না দিব না, শেষ মুষ্টিমেয় সম্বল আপনার বিদেশী বনিকে।" অম্বুজাসুন্দরী দেবী লিখলেন – "তোমরা প্রতিজ্ঞা কর এবং সমস্ত বাঙালীকে প্রতিজ্ঞা করাও যে বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।" বিদেশী জিনিস বয়কটের প্রতিজ্ঞা করেও বঙ্গবাসী সস্তা বলে বিদেশী জিনিষ কিনছে দেখে অম্বুজাসুন্দরী দেবী তীব্র ধিক্কার ভরা এক কবিতা পাঠালেন 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতে। এই কবিতাটির কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করার মতো –

"সবে জানে বাঙালী দুর্বল অলস
ভাত খায় ডাল খায়
গৃহকোনে নিদ্রা যায়
বন্ধু বান্ধবেরা কভু নাহি রয় বশ।
এক মুখে শতবার শতকথা কয়
করিয়ে প্রতিজ্ঞা বড়
মূহুর্তে ভাঙিছে দড়
বাঙালীর পেটে কথা থাকিবার নয়।"

সুকবি ও স্বদেশানুরাগিনী গিরিন্দ্র মোহিনী দাসীর সম্পাদনায় 'জাহ্নবী' পত্রিকায় (১৩১৫ আশ্বিন)সুন্দর এক কবিতা লিখলেন চম্পকলতা দেবী। মাতৃভূমির বোধনে তিনি সবাইকে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন, আর দেশমাতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন – 'দে জননি দেশভক্তি, দে জননি আত্মশক্তি।' গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী এ সময়ই প্রকাশ করলেন তাঁর 'স্বদেশিনী' কাব্যগ্রন্থ। কবিতা-প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী সাহিত্য গল্প-উপন্যাসও দেখা দিয়েছিল। সেদিনের সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরুপা দেবীর চক্র হলো স্বদেশীযুগের কাহিনী। এই উপন্যাসের নায়িকা সরলা স্বামীর স্বদেশসেবা ব্রতে স্বামীকে ভুল বুঝে প্রথমে বিঘ্ন ঘটিয়েছে কিন্তু পরে স্বামীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিলাসিতা ত্যাগ করে চরকা কাটা ও খদ্দর-পরা ব্রত গ্রহণ করলো।

স্বদেশী আন্দোলনে সূত্র ধরে বাংলায় নারীদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং অনুশীলন সমিতির গোপন বৈঠকে তিনি প্রায়ই যেতেন। লাবণ্যপ্রভা দেবী স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর বিপ্লবী ভ্রাতার জন্য নিয়মিত পিস্তল এবং বিপ্লবের পত্রিকা সংগ্রহ ও বহন করার কাজ করতেন। দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবী নিবারন ঘটককে সাহায্য করার জন্য সাতটি পিস্তল নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন। শ্রী অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন তাঁর ভ্রাতার পক্ষে মামলা চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর তাঁর মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রায় বিপুল সংখ্যক মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন। ননীবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৫৭) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অস্ত্র চালানোর দীক্ষা নেন। ১৯১৫ সালে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলে ননীবালা দেবী তার নকল স্ত্রী সেজে রামচন্দ্রের সাথে জেলখানায় দেখা করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের সাথে ননীবালা দেবী একযোগে কাজ করেন। ক্ষিতিশ চৌধুরী ও বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের যুগান্তর দলের সদস্য হন ময়মনসিংহের ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী (জন্ম ১৮৮৩)। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন। এভাবে বাংলার নারী স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন।

শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।যা ছিল এই আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতা। বঙ্গে নারী জাগরণের ইতিহাসে এই আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তবে একথা মনে হতে পারে যে, নারীর জীবনে মৌলিক পরিবর্তন কিছুই হয়নি। পুত্রের সঙ্গে কন্যার সমতুল্যতা আসেনি। স্বদেশী আন্দোলনের অংশগ্রহণকারিনী স্বর্ণপ্রভা বসু বলেছেন যে, "সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করিয়া বাহিরের কাজ করা উচিত নহে।" কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুরুষশাসিত সমাজের চোখে নারী রূপের পরিবর্তন ঘটে। মেয়েরা আন্দোলনে যোগ দিয়ে এটা প্রমাণ করলেন যে, তারা পুরুষের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা পুরুষের হিসেবের খাতায় নারীর মূল্য একটু বৃদ্ধি পেল। এছাড়া, নারীদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে নারী আন্দোলনের নেতৃত্বের পালাবদল ঘটে। উনিশ শতকে পুরুষরা ছিলেন নারী জাগরণের হোতা। এবার ধীরে ধীরে মেয়েদের হাতে এল নেতৃত্ব। কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, বক্তৃতা করে এবং সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে মেয়েরা মেয়েদের নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত করলেন। অনেকে মেয়েরা পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিজ হাতে তুলে নিলেন। ভারতী পত্রিকা ছিল সরলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। এখন দেখা দিল সুপ্রভাত, ভারত মহিলা, গৃহলক্ষ্মী, জাহ্নবী ইত্যাদি মহিলা সম্পাদিত বহুবিধ মাসিক পত্রিকা। লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের কথা মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। এর ফলে মেয়েদের আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি পেল এবং এক ধরনের ঐক্য বোধের উন্মেষ ঘটল। নারীর পাশে নারীকে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করে লেখা হল-

"সুপবিত্র রাখী বাঁধি পরস্পরে
এস হাত ধরে বলি দৃঢ়স্বরে
বোনে বোনে মোরা ভেদাভেদ নাই।"

উপসংহার (Conclusion):

মূলত, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমাজে নারীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, তাদের কর্মদক্ষতার বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। পুরুষের সাথ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সমাজে অবরোধ প্রথার শিথিলতা আসে। ঘরের কাজের পাশাপাশি নারী যে অন্যান্য কাজও করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে মেয়েদের নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন আসে। নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করলে দ্বিগুণ শক্তিতে সে কাজটি করা যায়, এসময় সেটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। বাঙালী নারীসমাজ এ আন্দোলনকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনটি সফলতায় নারীর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তারা সাহসী হয়ে ওঠেন। বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার নারী সমাজ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হতে শুরু করেন। ভোটাধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশে এক নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। কবি কামিনী রায়, শিক্ষাব্রতী কুমুদিনী মিত্র এবং সমাজসেবিকা মৃনালিনী সেনের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে বঙ্গীয় 'নারীসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অগণিত নারী যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাসন্তীদেবী, সুনীতি দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের দুঃসাহসিক অংশগ্রহণ বাংলার নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনকে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র :

- Sarkar, Sumit, 1977, The Swadeshi Movement in Bengal, New Delhi, Peoples Publishing House, PP-286-288.
- Basu, Aparna, 1976, The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom, in Indian Women : From Purdah to Modernity, B.R.Nanda (Ed), New Delhi, Vikash Publishing, P-17.
- Asthana, Prathima, 1974, Women's Movement in India, New Delhi, Vikash Publishing, P-18.
- Sarkar, Sumit, 1983, Modern India (1885-1947), Macmillan Publisher India Limited, Chennai, PP-112-121.
- Chandra, Bipan, 2009, History of Modern India, Orient Blackswan Private Limited, New Delhi, PP-250-252.
- Jha, Uma Sarkar and Pujari, Premlata, 1996, Indian Women Today (Vol-1), New Delhi, Kanishka Publishing House, P-109.
- Mohanty, J. 1996, Glimpes of Indian Women in the Freedom Struggle, Anmol Publications, New Delhi, PP-35-36.
- Roy, Nitish R. 1991, Hundred Years of Freedom Struggle (1847-1947), Calcutta, PP-130-131.
- Bakshi, S.R. 1990, Indian Freedom Fighters Struggle for Independence (Vol-5), New Delhi, PP-147-149.
- Banerjee, S.N.2016, A Nation in Making, Delhi, Rupa Publication, PP-196-198.
- Lahiri, Prodip Kumar,1984, Bengali Muslim Thought (1818-1947), Kolkata, K.P.Bagchi, PP-70-72.
- Bandopadhyay, Sekhar,2009, From Plassey to Partition : A History of Modern India, Orient Blackswan Private Limited, New Delhi, P-253.
- খাতুন, খায়রুন্নেসা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ. স্বদেশানুরাগ, নবনূর, পৃষ্ঠা – ২৭৭।

- বেগম, মালেকা, ১৯৮৯, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ৬২।
- দাশগুপ্ত, কমলা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা – ২৬৯।
- হোসেন, আনোয়ার,২০০৬, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৭১), কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশন, পৃষ্ঠা - ১৮৭-১৮৮।
- হক, বেগম মালেকা ও সৈয়দ আজিজুল,২০০১, আমি নারী, তিনশো বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস, ঢাকা, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ১২৩।